যুগান্তর

তারিখ 8 MAR 2013
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

রাজধানীতে ভর্তি বাণিজ্য ১॥

মণিপুর স্কুলে লটারির চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি

নেসারুল হক খোকন

ভর্তি মৌসুম শুরু হলে রাজধানীর অর্ধশতাধিক স্কুলের মধ্যে কয়েকটি স্কুলে অতিমাত্রায় ভর্তির জন্য রীতিমতো যুদ্ধ বেধে যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ যেন সন্তানের ভর্তি নয়, পিতা-মাতার ভর্তিযুদ্ধ। স্কুলে ভর্তিবাণিজ্য নিয়ে যুগান্তরের অনুসন্ধানের আজ প্রথম পর্বে থাকছে মণিপুর স্কুল।

মিরপুরের মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় চলে শুধু দু'জনের কথায়। একজন স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার এবং অপরজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেন। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাছে এরা দু'জন অনেকটা মানিকজোড় হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে, এ দু'জনের ক্ষমতার অপব্যবহারে রাজধানীর নামকরা গুরুত্বপূর্ণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ রীতিমতো পণ্যে পরিণত হয়েছে। কারও কারও মতে এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, হয়ে উঠেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ভর্তিবাণিজ্যের উন্মুক্ত পসরা বসিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে স্কুলটির ক্রীড়নকরা এমপিওভুক্তির বেড়াজালেও থাকতে চান না। সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে এমপিও সারেন্ডারের উদ্যোগও ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ভর্তি : দ্বিগুণ শিক্ষার্থী

(২০ পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির অর্থবাণিজ্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অনিয়ম-দুর্নীতির নানা তথ্য বেরিয়ে আসে।

রাজধানীর বৃহত্তর মিরপুর এলাকার এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বালক-বালিকা শাখার দুটি মূল ভবন ছাড়াও রয়েছে ৩টি শাখা স্কুল ভবন। শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটি। অবকাঠামোর তুলনায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কয়েকগুণ। তবে অভিভাবকদের অনেকে যুগান্তরকে জানিয়েছেন, ভর্তিবাণিজ্যের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির লেখাপড়ার মান খারাপের দিকে যাচ্ছে।

লটারির চেয়েও দ্বিগুণ অবৈধ ভর্তি : প্রায় দু'মাস ধরে মণিপুর স্কুলে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, প্রধান দুটি ক্যাম্পাস ও তিনটি শাখায় লটারির চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। প্রধান ক্যাম্পাসে বয়েজ স্কুলের মর্নিং ও দিবা দু'শিফটেই লটারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে ১২০ জন করে। কিন্তু বর্তমানে সকালে ক্লাস করছে ৩০২ জন। দিবা শাখায় ক্লাস করছে ১৯২ জন। এ দু'শিফটে লটারির চেয়ে অতিরিক্ত ২৫৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। প্রধান ক্যাম্পাসের গার্লস স্কুলে উভয় শিফটে লটারিতে নেয়া হয়েছে ১৮০ জন করে। তবে এ শাখায় মর্নিং শিফটে আছে ৩২৪ এবং দিবা শিফটে আছে ৩৩০ শিক্ষার্থী। এ শাখায় লটারির চেয়ে ৩৯৪ জন শিক্ষার্থীকে অবৈধ ভর্তি করা হয়েছে। ১ নম্বর রূপনগর শাখায় মর্নিং শিফটে লটারিতে নেয়া হয়েছে ৩৬০, অথচ ভর্তি করা হয়েছে ৫৪৬ জন। দিবা শিফটেও লটারিতে ছিল ৩৬০, ভর্তি হয়েছে ৫০৬ জন। মণিপুর স্কুলের এ শাখায় লটারির চেয়ে ৩৮২ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। ইব্রাহিমপুর শাখায় কোন লটারিই হয়নি। তবে ভর্তি করা হয়েছে মর্নিং শিফটে ৩২৪ ও দিবা শিফটে ৩৫৯ জন। এ শাখায় যারাই আবেদন করেছে তাদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। শেওড়াপাড়া ৩ নম্বর শাখায় লটারিতে নেয়া হয়েছে মর্নিং ও দিবা শাখায় ২৪০ জন করে। আর ভর্তি করা হয়েছে মর্নিং শাখায় ৩৬২ আর দিবা শাখায় ৩৫৯ জন। এ ক্যাম্পাসে অবৈধ ভর্তি হয়েছে মোট ২৪১ জন।

ভর্তিবাণিজ্যের নেতৃত্বে ম্যানেজিং কমিটি : স্কুলটির বেশ কয়েকজন কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, এখানে রক্ষকরাই ভক্ষক। অর্থাৎ ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা সম্পৃক্ত। আর ভর্তিবাণিজ্যের মূল হোতা কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার ও সদস্য সচিবের পদে থাকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেন। এছাড়া কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন— টিচার অর্থাৎ শিক্ষক প্রতিনিধি ৩ জন, স্কুল শাখায় ৪ অভিভাবক প্রতিনিধি, কলেজ শাখায় দু'জন, একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য একজন, দাতা ও শিক্ষানুরাগী সদস্য দু'জন।

জানা গেছে, স্কুল কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্যই প্রভাবশালী এবং প্রত্যেকেই এমপির অনুসারি।

অবৈধ কোটা : স্কুলের ভর্তি নীতিমালায় নিষিদ্ধ হলেও বর্তমান পরিচালনা কমিটির সদস্যরা প্রত্যেকে ২৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছেন। এটি তাদের নিজেদের বানানো কোটা। কেউ কেউ ক্ষমতার জোরে এ কোটার চেয়ে বেশি সংখ্যায় ভর্তি করাতে সক্ষম হয়েছেন। আর প্রতিটি ভর্তির ক্ষেত্রে নেয়া হয়েছে কমপক্ষে ১ থেকে সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা। যারা খাব দালাল ধরে ভর্তি করেছেন তাদের খরচ বেশি হয়েছে। অলিখিত ও অগ্রিম নেয়া ভর্তিবাণিজ্যের এসব টাকার কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেক অভিভাবক এ বিষয়ে চমকপদ তথ্য দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার সন্তানের স্বার্থের প্রশ্নে এ নিয়ে কোন কথাই বলতে চাননি। তবে যুগান্তরের অনুসন্ধানে ভর্তিবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দালালের সঙ্গে কথা বলে টাকা দেয়ার প্রমাণও মিলেছে। গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা এ সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজ যুগান্তরের হাতে রয়েছে।

নীতিমালায় যা আছে : প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা ২০১২-এর ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সন্তানদের (যদি থাকে) তাদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ থাকবে। ন্যূনতম যোগ্যতা বলতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর থাকতে হবে। তবে পোষ্য, আত্মীয়-স্বজন বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের জন্য কোন কোটা সংরক্ষিত থাকবে না। নীতিমালার ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এ নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে।

এমপিও সারেন্ডার এবং ... : মণিপুর স্কুলের একজন সিনিয়র শিক্ষক ভর্তিবাণিজ্য সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন। এ শিক্ষকের দেয়া বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রভাবশালীদের কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য জানা গেছে। এ সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারের ভিডিও ফুটেজ যুগান্তরের হাতে রয়েছে। এ শিক্ষক যুগান্তরকে জানান, প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেন গত বছর ছাত্র প্রতি বৈধ ভর্তি ফি ৫ হাজার টাকা নেয়ার কথা থাকলেও নিয়েছেন অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা করে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবগত হওয়ার পর টাকা ফেরত দেয়ার কথা উঠলেও তিনি তা ফেরত দেননি। এ কারণে প্রধান শিক্ষকের এমপিও বাতিল করা হয়। কিন্তু এতে প্রধান শিক্ষকের বেশি লাভ হয়েছে। তিনি জানান, এমপিও থাকা অবস্থায় তিনি যে বেতন পেতেন এখন প্রতিষ্ঠান থেকে তার চেয়ে তিনগুণ বেতন-ভাতা পান। এ শিক্ষক জানান, এরকম সুবিধার কারণে এখন মণিপুর স্কুলের সব শিক্ষকের এমপিও সারেন্ডারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শিক্ষকদের নিয়ে সংসদ সদস্য কামাল মজুমদার তার নিজের অফিসে বৈঠক করেন। সভায় এ বিষয়ে শিক্ষকরা পক্ষে ও বিপক্ষে মত দিলেও বেশিরভাগ শিক্ষকের প্রস্তাব অনুযায়ী এমপিও সারেন্ডারের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। তবে এমপিও সারেন্ডারের পর কর্মরত শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত কত টাকা বেতন-ভাতা দিতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বের করতে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে দেয়া হয়।

এ শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, এমপিও না থাকলে অনিয়ম-দুর্নীতি ও ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে অতিরিক্ত আরও বেশি টাকা আদায় করতে পারবেন। এতে নানামুখী আয় ও বাণিজ্য আরও বাড়বে। আর কোটি কোটি টাকার ভাগ চলে যাবে প্রভাবশালী শিক্ষকসহ উপর মহলের পকেটে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এমপিও সারেন্ডারের বিপক্ষে প্রয়োজনে পালিয়ে বেড়াবেন। তবুও এমপিও সারেন্ডার করবেন না।